"সত্যাগ্রহ : লড়াইয়ের জন্যে মহাত্মা গান্ধীর এক উপহার"

সুপ্রিয় মুন্সী

সভ্যতার অগ্রগতির জন্যে মহাত্মা গান্ধীর দুটি বিশেষ অবদান মানব-সভ্যতার ইতিহাসে তাঁকে চিরকাল অমর করে রাখবে - একটি 'সর্ব্বোদয়'-দর্শন ও তার সমার্থক সমাজ এবং অপরটি তা প্রতিষ্ঠায় এক অভিনব পন্থা 'সত্যাগ্রহ'। সত্যাগ্রহ অবশ্য একটি মৌলিক, মূল্যবোধ-সম্পন্ন জীবন দর্শন বা জীবনচর্যার বিষয়ও।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন যে গান্ধীজী আমাদের 'লড়াই' বা যুদ্ধের একটি হাতিয়ার উপহার দিয়েছেন - এমন এক লড়াই যেখানে উভয় প্রতিদ্বন্দীরই শারীরিক কোন ক্ষতি হয়না বা কাউকে মৃত্যু বরণ করতে হয়না, বিজয়ী এবং পরাজিত বলে কেউই থাকে না এবং পরিশেষে উভয় উভয়ের মিত্র, কোন কোন ক্ষেত্রে ভক্তেও পরিণত হয়। অর্থাৎ শত্রুতার চিরকালীন অবসান হয়। এটি ব্যক্তি, দল, দেশ, সবকটি - ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও সফল হতে পারে।

এক্ষেত্রে আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা জেনারেল স্মাট্সের কথা স্মরণ করতে পারি। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন এবং নানা অন্যায়, অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং ন্যায্য 'নাগরিক' দাবি আদায়ের জন্যে তা চালনা করতে থাকেন জেঃ স্মাট্স্ই তখন সেখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। একবার কারাগারে অবস্থানের সময়ে গান্ধীজী স্মাট্স্ সাহেবের সঠিক জুতোর অভাবের কথা শোনেন এবং নিজের হাতে দুটি চপ্পল তৈরী করে তাঁকে উপহার দেন। গান্ধীজী স্বাবলম্বী ছিলেন, নিজের হাতে অনেক কিছুই করতে পারতেন যা তাঁকে আত্মবিশ্বাসী করেছিল। ১৯৬৯ সালে গান্ধী-জন্মশতবার্ষিকীর সময়ে জুতো দুটি সম্বন্ধে স্মাট্স্ সাহেব লিখেছিলেন যে বহু বছর সেগুলি তিনি ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু এত বড় মহৎ মানুষের যোগ্য বলে নিজেকে কোনদিনই ভাবেননি। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারী গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণের পরে শ্রী স্মাট্স্ যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন তা হল - "আমদের মধ্যে যিনি ছিলেন রাজপুত্র তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল"। অর্থাৎ শত্রু ক্রমে মিত্র থেকে ভক্তে পরিণত হলেন। অবশ্য সত্যাগ্রহের এটি একটি দিক বা মাত্রা মাত্র - সত্যাগ্রহ বহুমাত্রিক।

সত্যাগ্রহ সত্যের প্রতি আগ্রহ এবং দৃঢ়তা বোঝায়। সত্যাগ্রহের দুটি বড় শর্ত হল অহিংসা ও মানুষের প্রতি অটল বিশ্বাস। গান্ধীজী অবশ্য অগাধ ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথাই বলেছেন যা সত্যাগ্রহীকে সঞ্জীবিত রাখে। সেইজন্যে গান্ধীজী আত্মশক্তির কথা বলেছেন এবং হিংস-পন্থাকে পশুশক্তি বলে অভিহিত করেছেন।

১৯০৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জোহান্স্বার্গের এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে প্রায় তিন হাজার ভারতীয়, ইত্যাদি একত্রিত হন, সহজ কথায়, ট্রান্স্ভাল সরকার দ্বারা এশীয়দের পক্ষে আবশ্যিক একটি এশীয় রেজিষ্ট্রেশন আইন প্রনয়ণের পরিপ্রেক্ষিতে। এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর অভিমত ছিল যে পৃথিবীর কোথাও স্বাধীন মানুষের জন্যে এই প্রকৃতির কোন আইনের অস্তিত্ব নেই এবং স্বভাবতই আন্দোলনের মাধ্যমে এর বিরোধিতা করা উচিত। কিভাবে এই আন্দোলন হবে তা স্থিরীকৃত করার সময়েই হাজী হাবিব নামে এক বক্তা বলেন যে তিনি প্রতিজ্ঞা করছেন এই কালা আইনের বিরোধিতায় তিনি আন্দোলন করবেনই। অবশ্যই তা অহিংস-পথেই হবে। গান্ধীজী এক নতুন আলো দেখতে পেলেন এবং 'সদাগ্রহ' হয়ে সত্যাগ্রহের বা সত্য ও অন্যায়ের প্রতি অবিচল থেকে এবং বিরোধী পক্ষের প্রতি কোনপ্রকার বিদ্বেষভাব না রেখে অহিংস সক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের পন্থা উদ্ভাবন

করলেন। এটা শুধু যুগান্তকারী এবং ক্রান্তিকারীই নয়, হিংসা-দীর্ণ, বিবাদ-বিদ্বেষে জর্জরিত, অশান্ত পৃথিবীর কাছে সকলের কল্যাণের জন্যে আন্দোলন সংগঠনে একমাত্র মানবিক পদ্ধতি।

গান্ধীজীর সঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইন্‌স্টাইনের কোনদিন সাক্ষাৎ হয়নি, যদিও তিনি গান্ধীজীকে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়েছিলেন ("ভবিষ্যৎ বংশধরেরা হয়ত বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে রক্তমাংসে গড়া এমন একজন মানুষ আমাদের এই পৃথিবীতে হাঁটাচলা করেছিলেন" - ১৯৪৪ সালে গান্ধীজীর ৭৫তম জন্মদিনে আইন্‌স্টাইনের শ্রদ্ধার্ঘ)। কিন্তু ১৯৪৯ সালে তাঁর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বাড়ীতে যখন পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান তখন আইনস্টাইন্ তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তাঁরা যখন আণবিক বোমা আবিষ্কার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমগ্র সভ্যতা ধ্বংসের ব্যবস্থা করছিলেন তখন তিনি লক্ষ্য করছিলেন যে কিভাবে গান্ধীজী তাঁর অহিংস সত্যাগ্রহ-হাতিয়ারকে আরও তীক্ষ্ণ ও উৎকৃষ্টতার মাধ্যমে সভ্যতাকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা করছেন এবং একমাত্র এই পথেই মানব-সভ্যতা ও পৃথিবী বাঁচতে পারে।

সত্যাগ্রহের নানা মাত্রা। যার শেষ পর্যায়ে আমরণ অনশন। জীবন ও সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর যত প্রয়োগ গান্ধীজী প্রদর্শন করেছেন সমাজ পরিবর্ত্তনের ক্ষেত্রেও এর ভূমিকা সুদূরপ্রসারী এবং এক্ষেত্রে সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অভিনব একটি গুচ্ছ-কার্যক্রম 'গঠনমুলক কার্যক্রম'-এর কথা প্রথমেই মনে আসে। এরই সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনে 'একাদশ ব্রত' পালনের মাধ্যমে যথার্থ সত্যাগ্রহীর পাঠ গ্রহণ গান্ধজী নির্দেশিত প্রকৃষ্ট পন্থা। একাদশ ব্রত হল সত্য, অহিংসা, অস্তেয়, অসংগ্রহ, ব্রহ্মচর্য, শারীরিকশ্রম, অস্বাদ ব্রত, স্বদেশী স্পর্শ ভাবনা, সর্ব্বত্র ভয়বর্জন, সর্ব্বধর্ম্মে সমভাব, ইত্যাদি। কারণ গান্ধীজী সত্যাগ্রহকে শুধুমাত্র লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসাবেই দেখতে চাননি, এর মাধ্যমে তাঁর লোভহীন, আদর্শ সমসমাজের জন্যে যোগ্য সংস্কৃতিবান মানুষ তৈরীর কথাও ভেবেছিলেন। আজকের স্বার্থ-সর্ব্বস্ব, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য; ভোগী সমাজকে সর্ব্বোদয় বা সার্বিক কল্যাণমুখীসমাজে রূপান্তরিত করতে হয় তাহলে সত্যাগ্রহ ও সত্যাগ্রহীর জীবনই আদর্শ জীবন।

২০০১ সালের ৯/১১ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশে যে ব্যাপক হিংসা ও সন্ত্রাসের প্রকাশ আমরা দেখেছি, যা প্রায়ই বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে সংগঠিত হচ্ছে এবং যার দ্বারা নিরীহ মানুষজনই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন, ব্যাপক জীবনহানিও ঘটছে, তা থেকে পরিত্রাণের উপায় সম্ভবতঃ গান্ধীজীর এই অহিংস সত্যাগ্রহ পন্থা ১১/৯ এর শতবার্ষিকী উদযাপন লগ্নে এর তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য।

নাৎসী প্রচার-মন্ত্রী গোয়েবল্‌স্ (Dr. Paul Goebbels) তাঁর ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসের ৬ তারিখ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে লিখিত ডায়েরীর পাতায় মন্তব্য করছেন যে "নিষ্ক্রিয় আন্দোলন শুরু করে গান্ধীজী এক অবিবেচকের মত আচরণ করেছেন (১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন), তিনি বোকা!" সেই গোয়েবল্‌স্‌ই তাঁর ডায়েরীর পাতায় ১৯৪৩ সালের ৫ মার্চ মন্তব্য করছেন - "গান্ধীজী তাঁর অনশন সমাপ্ত করেছেন। তিনি ঐশ্বরিক মানুষ.....('Man of God')"।